International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182 Print ISSN: 2349-5979
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 1; January 2016; Page No. 146-149

আধুনিক সময় ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা ঃ মোক্ষ বিষয়ে এক অধ্যয়ন

জয়ন্ত নন্দীণ

গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ / সারসংক্ষেপ (Abstract)

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই হল চতুবর্গ। ভারতীয় দর্শণের মূল লক্ষ্য হল মোক্ষ তথা মুক্তি, যদিও দর্শনসম্প্রদায়ভেদে মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় ভিন্ন। আবার কাব্যশাস্ত্রবিদরাও তাদের কাব্যের প্রয়োজনে চতুবর্গের অন্যতম তথা মোক্ষের কথা বলেছেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও মোক্ষের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। তবে এই চতুবর্গের শ্রেষ্ঠ মোক্ষ কিনা তা কিন্তু এই গবেষণাপত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। এই গীতার ভাবধারায় মোক্ষের স্বরূপ কিভাবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং আধুনিকজনজীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি তাই হল আলোচ্যবিষয়। আসলে এই 'Ulratr ModernNuclear age' এ আমরা যতই উন্নতির দাবিদার হিসাবে আওয়াজ তুলি না কেন, মিথ্যে জ্ঞানের অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে যতই নিজেদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা মনে করিনা কেন, আসলে আমরা এক একটি বিশুদ্ধ আত্মা, যা পরমাত্তার (Supreme God) অংশমাত্র আর পঞ্চভূতের সমন্বয়ে গঠিত এই স্থূলদেহগুলি জড়, অচেতন, আত্মাই একমাত্র সচেতন বস্তু। তাই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু নেই সবই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জগৎ নামক মায়ার কুহকে জন্ম নিয়েই জীব ভুলে যায় তার প্রকৃতস্বরপ। ভোগ, লালসা, কামনা, বাসনা, মিথ্যা অহঙ্কারে সে জর্জরিত করে ফেলে তার পবিত্র আত্মাকে। এই অতৃপ্ত আত্মা ভবচক্রের নিয়মে পুনরায় দেহ ধারন করে যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকে। এই আত্মার মুক্তিই হল প্রকৃতমুক্তি আর এই মুক্তিলাভের অন্যতম সোপান হল শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

কূটশব্দ (keywords)

আত্মা, পরমাত্মা, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মোক্ষ, সেবাধর্ম, চতুবর্ণ।

ভূমিকা (Introduction)

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের যুগে প্রগতিশীল উন্নয়নের হাত ধরে বিশ্ব আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির রথের চাকা আজ পৃথিবী ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে ভিন গ্রহে। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে চাঁদ ও মঙ্গল-এর বুকে জমি কেনার হিড়িক। বিজ্ঞান এখন Big Bang Theory, Black Hole ও নতুন নতুন Galaxy -এর সন্ধানে ব্যস্ত। এই সৌরজগতের বাইরেও নাকি অজস্র মহাজগৎ আছে। বিজ্ঞানের দৌলতে ব্যাঙ্-এর ছাতার মত গজিয়ে উঠছে মাল্টিপ্লেক্স, শপিং মল। উন্নয়নের পারদ একদিকে যেমন তড়তড়িয়ে উপরে উঠছে তারই সাথে পাল্লা দিয়ে নামে যাচ্ছে আমাদের নৈতিকতা, আদর্শবোধ ও মানবিক মূল্যবোধ। পৃথিবীর গভীরে আজ গভীরতম অসুখ। এই অসুখটির নাম হল ভোগবাদ। উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের ভোগবাদি মানসিকতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যতই আমরা ভোগাসক্ত হয়ে পড়ছি ততই আমাদের আত্মিক অবক্ষয় ঘটছে। অফুরন্ত আমাদের লালসা। মনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে বেড়ে চলা এই লালসা, কামনা, বাসনা এই কথায় উচ্চ আকাঙ্খা, আমাদের ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা শিক্ষিত হচ্ছি কিন্তু মার্জিত ও রুচি সম্মত হতে পারছি না। বর্তমানে Man Making Education আমাদেরকে নামী -দামি ডিগ্রি ও জীবিকা নির্বাহের পথ দেখাতে পারে, কিন্তু তাতে করে এই পুথিগত বিদ্যার দ্বারা আমাদের কোনরকম আত্মিক-উন্মোচন (Spritual Development) হয় না, তাই শিক্ষিত হয়েও আমরা এখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন পঙ্কিল জীবনে নিমজ্জিত। জাগতিক বিষয়ে ভাবাপন্ন কোন মানুষের মনে আজ সুখ নেই। সারাদিনের কর্মব্যস্তময় জীবনে রাতের বালিশে মাথা রেখেও হিসেব করি সারাদিনের লাভ-ক্ষতি। আরো চাই আরো চাই - এই চিন্তা করে করে মাথার শিরা-উপশিরা জট পেকে যাচ্ছে। তবু চাহিদা আর পূরণ হয় না। তাই আমরা বর্তমানে কেউ নিজের অবস্থায় সুখী নয়। তাই সমগ্র বিশ্ব আজ একটি প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি -এই যন্ত্রণার মুক্তি কোথায় ? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে একটুকরো শান্তি। এখন প্রশ্ন হল মুক্তি বলতে আমরা কী বুঝি ? আক্ষরিক অর্থে আমরা যখন বলি -হে ভগবান! আমাকে এবার মুক্তি দাও, তখন আমরা আমাদের এই জড় জগতের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত পাওয়ার প্রার্থণা করি। কিন্তু এই মুক্তি আমাদের শরীরের নয়, এই মুক্তি আমাদের আত্মার। মুক্তি মানে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোকে আসা। মুক্তি মানে জীবের প্রকৃত স্বরূপে সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান। মুক্তি মানে জড় জগতের বন্ধন থেকে আত্মার শাশ্বত মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি কিভাবে আমরা পেতে তারই বীজ লুকিয়ে আছে শ্রীমদ্ভগবৎ -গীতার সারগর্ভ তত্ত্বে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা হল বেদের অখিল জ্ঞানরাশির সারভূত অংশ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আঠারোটি অধ্যায় বিশিষ্ট শ্রীমদ্ভগবদগীতা হল পরমেশ্বর ভগবানের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন যখন স্বজনদের দেখে যুদ্ধ করর না বলে মনস্থির করলেন তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্ববাসীকে পান্ডব এবং কৌরব - এই দুইপক্ষে দাঁড় করিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অর্জুনকে যে সারস্বত উপদেশ দিয়েছিলেন তাই হল গীতার মর্মসার। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা হাতের কাছে এই অমৃত পেয়েও তার সৎ ব্যবহার না করাই জাগতিক মায়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে এই যন্ত্রণার ভবসাগরে বার বার ডুবে মরি।

জাগতিক মায়ার কুহকে আচ্ছন্ন বিশ্বচরাচর উপলব্ধি করতে পারে না তা প্রকৃত স্বরূপ। কখনো আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না আমি কে ? কোথা থেকে এসেছি ? কেন -ই বা এসেছি ? অজ্ঞানবশতঃ আমি বলতে আমরা আমাদের স্থূল শরীরকে বুঝি, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই শরীর হল জড় দেহ, আর এই জড়দেহের চেতন অংশটি হল আত্মা। এটি জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বরের অনুৎকৃষ্টা শক্তির প্রকাশ। জড় জগতের স্থূল পদার্থ ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এবং সূক্ষ্ম পদার্থ মন, বুদ্ধি ও আহংকার এই সবগুলি ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতির বা উৎকৃষ্টা শক্তির অন্তর্গত[১] । ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীবের দ্বারা সক্রিয় না হলে বিশ্ব

ব্রহ্মান্ডের কোন কর্ম সাধিত হয় না। তাই জীব সর্বদায় ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাদের স্বাধিন অস্তিত্ব নেই। জীব ও

ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীমদ্ভগবৎ-এ বলা হয়েছে -

''অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা -
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া।।''২

আমরা আমাদের জড় দেহটির সুখের জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে কর্মমুখর করে তুলি। সযত্নে আমরা আমাদের শরীরটিকে লালল-পালন করি। কিন্তু একবারো ভাবি না এ শরীর অনিত্য আর এ শরীরের অন্তরে শরীরি যথা আত্মা তা নিত্য, শাশ্বত, জন্ম-মৃত্যু রহিত। তাই এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে,

''ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতো'য়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।''৩,৪

কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আমরা আমাদের শরীরটিকে আত্মা বলে মনে করি কিন্তু তা নয়। সাপ যেমন খোলসা ত্যাগ করে আমাদের আত্মা তেমনি শরীর ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। জগতের প্রতিটি জীবাত্মা পরমাত্মার অংশবিশেষ। এই আত্মাই হল একমাত্র চেতনশীল বস্তু, যা পরমেশ্বরের অন্তরঙ্গ পরাশক্তির প্রকাশ। আমরা সবাই বিভু পরিমাণ পরমেশ্বরের অনুসদৃশ অংশ। তিনিই আমাদের পালক পিতা, তিনিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা সর্বশক্তিমান। আমরা তারই সেবক, নিত্য দাস। কাজেই এই জগতে আমাদের আসার উদ্দেশ্য হল ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হয়ে সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে
আদের পরম-পিতাকে সেবা করা। সেবা হল আমাদের সহজাত ধর্ম। আমরা তিদিন কারো না কারো-র সেবা করে থাকি। অনেকে বাড়িতে বিড়াল-কুকুর পুষে তাদের সেবা করে-এর থেকে বোঝা যায় সেবা আমাদের ধর্ম। কিন্তু মায়াবদ্ধ আমরা সবাই আমদের জড়-জাগতিক বিষয়ের সেবাই মগ্ন থাকি।
আমাদের দেহটি জড়-প্রকৃতির উপহার। এই জড় দেহের সঙ্গে যারা গভীরভাবে আসক্ত তারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানরহিত অলস ব্যক্তি। যে দেশে তারা জন্ম নিয়েছে সেই দেশকে তারা-পূজা করে। তাদের অনুকূলে কতকগুলি সংস্কারের অনুষ্ঠান করাকে আমরা ধর্ম বলে মনে করি। সমাজ সেবা, জাতিয়তাবাদ -এই ধরনের জড় উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কতকগুলি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকে আর ততই জগতের মায়াজালে নিজেদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধতে থাকে। কাজেই এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রথমস্তর হল আত্মোপলব্ধি। ভগবৎ তত্ত্বকে যিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই বুঝতে পারেন জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কিন্তু আমাদের এই আত্মস্বরূপের জ্ঞান নেই বলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে এই জড় জগতের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পরি এবং বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু একবারও ভাবি না এই আপাত সুখের আড়ালে আছে তিক্তময় বিষাদ। তাই আমরা আমাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করার জন্য এ সবই আমার আমার বলে দাবি করি। ভাবতে অবাক লাগে একটুকরো জমিকে কেন্দ্র করে সন্তানের হাতে খুন হতে হয় তার বাবাকে। এরকম শুধু পারিবারিক দ্বন্দ্ব নয়, গাঁজা ভূখন্ডকে কেন্দ্র করে সিরিয়া প্যালেস্তাইন যুদ্ধ, কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্থানের দ্বন্দ্ব আজও অব্যাহত। কিন্তু একবারও কেউ ভাবে না গাঁজাই হোক বা কাশ্মীরিই হোক কোন ভূখন্ডই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এই ভূখন্ড ছিল, আছে, থাকবে এবং তা নির্ভর করছে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লোভ-লালসা আমাদের এতটাই গ্রাস করে নিয়েছে যে আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের প্রকৃত-স্বরূপ। তাই বিশ্বজুড়ে আজ অশান্তি, খুন-রাহাজানি, ধর্ষণ, অপহরন ইত্যাদিতে বিষিয়ে উঠেছে এই জড় জগৎ আর আমাদের চিত্ত হচ্ছে কলুষিত।
যথার্থ জ্ঞান ও ভগবৎ ভক্তির দ্বারা জীবের মুক্তি সম্ভব-এই উপলব্ধি হওয়ার পর আমরা যদি ভেবে নিই আমরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অংশবিশেষ, তিনিই অংশী 'একমেব অদ্বিতীয়ম্', কাজেই আমাদের সমস্ত কর্ম ফেলে রেখে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণ নাম জপ করলে আমাদের মুক্তি হবে, এ ভাবনা ভুল। কারণ দেহ প্রতিপালনের জন্য প্রতিটি জীবকে কর্ম পালন করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন -

''নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণ ঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণ ঃ।।''৫

অর্থাৎ ''তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর, কেন না কর্মত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রা ও নির্বাহ করতে পারে না।''।

জগতে বেঁচে থাকতে গেলে কর্ম করতে হয় বলে সমাজের বর্ণ, আশ্রম অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে জীবের ভিন্ন-ভিন্ন কর্ম নির্ধারিত হয়েছে, যাতে তাদের উদ্দেশ্যগুলি যথাযথ ভাবে সাধিত হয়। এই বিশাল বিশ্বজুড়ে যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে, সেই কর্মযজ্ঞের নিয়ন্ত্রা হলেন পরমেশ্বর। যজ্ঞ বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তথা যজ্ঞানুষ্ঠানকে বোঝায়। বেদে বলা হয়েছে - 'যজ্ঞবৈ বিষ্ণু'। পক্ষান্তরে নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ করা আর সরাসরি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করার দ্বারা একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা। 'বর্ণাশ্রমাচারারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে।'৬ তাই কর্মযজ্ঞে ব্রতী হওয়া মানেই কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম সম্পাদন বোঝায়। একমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম আমাদেরকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে না। ইন্দ্রিয় তর্পনের জন্য কোন কিছু করা উচিত নয়। এভাবেই অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায় তা নয়, ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। যেহেতু কর্মফলের বাসনা আমাদেরকে জাগতিক বন্ধনে বেঁধে রাখে সেহেতু ফলের বাসনা রহিত নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আমাদের জীবাত্মার মুক্তি সাধিত হয়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল -নিষ্কার্ম কর্ম কীভাবে সম্ভব ? প্রতিটি ক্রিয়ার যেমন সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে, প্রতিটি কারণ এর যেমন কার্য আছে, তেমনি কর্ম থাকলে ফল তো থাকবে। কাজেই কর্মফলরহিত কর্ম কী ? কিভাবেই তা সম্ভব ? কারণ যখন আমরা কোন কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করি তখন তার পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে, কাজেই উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম কি করে সম্ভব ? তারই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

''এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুক্তমম্।।''৭

অর্থাৎ সমস্ত কর্মফলের আশা ত্যাগ করে অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্যবোধে কর্মানুষ্ঠানের কথা বললেন শ্রীকৃষ্ণ। কর্ত্তব্যবোধ অর্থাৎ আমাদের

নৈতিক দায়িত্ববোধ আর নৈতিক দায়িত্ব মানেই সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে তার নিত্য সেবা। শ্রীকৃষ্ণের অভয়চরণে যদি সমস্ত কর্মকে অর্পণ করা হয় তাহলে কর্মফলের ভোগের দ্বারা আমাদের আর জড়াবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না। এই

প্রসঙ্গে তিনি বললেন -
''ব্রহ্মণ্যোধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা করোতি যঃ ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।।''৮
ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, --
''কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতংসমা ঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতো'স্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।''৯

কর্ম করতে করতে কর্ম সমূহে লিপ্ত না হওয়ার অন্য কোন পথ নেই। গীতার মোক্ষযোগে ত্রিবিধ কর্মের বিধা দেওয়া হয়েছে - শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ বৃত্তিমূলক কর্তব্যকর্মাদি অনাসক্তবাবে কর্তৃত্ববোধ বর্জন করে সম্পাদিত হলে এবং সেই কারণেই অনুরাগ অথবা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে, পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি কিংবা আত্ম উপভোগ রহিত হয়ে সম্পাদিত হলে, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।[১০] কিন্তু ফলের আকাঙ্খাযুক্ত ও অহংকারযুক্ত হয়ে বহুকষ্ট সাধ্য করে যে কর্মের অনুষ্ঠান হয়। সেই কর্ম রাজসিক কর্ম[১১] আর ভাবী বন্ধন, ধর্ম জ্ঞানাদির ক্ষয়,

হিংসা এবং নিজ সামর্থ্যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামসিক কর্ম বলে।[১২] কাজেই সমস্ত কর্মই জড়জগতের তিনটি গুণের অধীন। এই তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজ, তম। সত্ত্বোগুণ হচ্ছে জ্ঞাণোদ্ভাসিত রজোগুণ হচ্ছে জড় জাগতিক ও বৈষয়িক এবং তমোগুণ হচ্ছে আলস্য ও কর্ম বিমুখতার সহায়ক।

জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণ প্রেম রজোগুণের প্রভাবে কামে পর্যবসিত হয়। কামের অতৃপ্তির ফলে হৃদয়ের ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ থেকে মোহ আর মোহ থেকে জড় জগতের বন্ধন। তাই কাম হচ্ছে জীবের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।[১৩] এই কাম এবং ক্রোধ তমোগুনের প্রকাশ। আমাদের মধ্যে এই তিনটি গুণের প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে। রজো গুণের প্রভাবকে তমো গুণে অধঃপতিত না হতে দিয়ে যদি সত্ত্বগুণে উন্নীত করা যায় তাহলে পরমার্থিক শান্তি আমরা লাভ করতে পারি। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের বেশীরভাগ মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন তাই তাদের মনে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে কামনা -বাসনা। আর এগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য যখন সৎ পথে তা সম্ভব হচ্ছে না, তখনই অসামাজিক, অনৈতিক কর্মের মধ্য দিয়ে তারা হয়ে উঠছে এক একটি সমাজের শ্রেণীশত্রু, দেশদ্রোহী তথা রাষ্ট্রদ্রোহী। যারা রাজসিক গুণে আচ্ছন্ন তারা সঠিক পথে কর্ম করলেও তাদের সমস্ত কর্ম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। কাজেই ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা যখনই উচ্চাকাঙ্খী হতে থাকে তখনই তারা তমোগুণে অধঃপতিত হয়। কিন্তু যিনি সাত্ত্বিক
জ্ঞানী তিনি যেহেতু সমস্ত প্রাণীতে এক-অবিভক্ত চিন্ময়ভাব দর্শন করেন এবং অনেক জীব পরস্পর ভিন্ন হলেও চিন্ময় সত্ত্বায় তারা যে এক, এই বোধের দ্বারা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্মফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম সাধন করার জন্য জগতের দুঃখ -যন্ত্রণা-সুখ -আনন্দ-লোভ-লালসা-কামনা-বাসনা কোন কিছুতেই তারা বিচলিত হন না। কাজেই জগৎ জুড়ে এই যে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, তার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের অভাব। মানবিকতা ও আদর্শবোধের অভাব। আর এসবেরই পিছনে আছে তমো গুণোদ্ভূত লোভ-লালসা, অলস-নিদ্রা, প্রমাদ। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত তমোগুণকে রজোগুণে এবং রজো গুণকে সাত্ত্বিক গুণে উন্নীত করা।

সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটি স্বভাবজাত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের কর্মসমূহ বিভক্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন ট্র

''চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।''[১৪]

আমাদের সমাজব্যবস্থাই চতুবর্ণ প্রথা এখন আর নেই। কিন্তু প্রতিটি কর্মজীবি মানুষেরই তার স্বধর্মপালন করা উচিত। যেমন, শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য - এগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসনক্ষমতা - এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।[১৫] কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম[১৬] এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত[১৭]। যে মানুষ শূদ্রের কাজকর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট, তার পক্ষে কৃত্রিমভাবে নিজেকে ব্রাহ্মণে বলে জাহির করা উচিত নয়। এ যেমন সত্য, তেমনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে যদি তিনি সাত্ত্বিকগুণ অর্জণ করতে না পারেন তবে তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণে বলে দাবি করতে পারেন না। কারণ এই চতুবর্ণ কখনো বংশগত নয়, কাজেই তা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে না, তা অর্জিত। তিনটি গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একজন ব্রাহ্মণে যেমন ক্ষত্রিয়োচিত্ত কর্ম করতে পারেন না। তেমনি একজন ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও ব্রাহ্মণের কর্ম করা সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি কর্মজীবি মানুষ যদি তাদের স্বধর্ম পালন না করে, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলার দানা বাঁধে। যেমন, একজন কৃষক যদি মনে করে তিনি রোগীর চিকিৎসা করবেন - তা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি একজন ডাক্তারের পক্ষেও জমিতে লাঙ্গল কর্ষণ সম্ভব নয়। তাই আমরা যদি প্রত্যেকেই আমাদের কর্তব্যকর্ম কে স্বধর্ম হিসাবে পালন করতে পারি তাহলে জড় জগতে প্রতিটি কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিটি কর্মেরই উদ্দেশ্য হল পরমেশ্বরের সেবা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় চতুবর্ণ প্রথাকে আমরা সত্ত্ব, রজ, তম-এই তিন গুণের নিরিখে বিচার না করে জন্ম পরম্পরায় ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, শূদ্রের পুত্র শূদ্র হবেই এই নিয়ম তৈরী করেছি। তাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় রজ ও তমোগুণকে অধঃপতিত করে সাত্ত্বিক গুনের আরাধনাই আমরা যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারি, তাহলে এই জড়বন্ধন থেকে আমাদের জীবাত্মা মুক্তি পাবে এবং এর জন্য যে পরিবেশ-পরিকাঠামোর প্রয়োজন তা গীতার ভাবধারার যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব।
পরমেশ্বর ভগবানের সাথে আমাদেরই যে নিত্য সম্বন্ধ, সে সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার জন্যই জীব সকল জড়া প্রকৃতির মায়ার বন্ধনেই আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। শ্রীটমদ্ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী নানাভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবানই হচ্ছে সবকিছুরই পতি।

''শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতি ঃ প্রজাপতির্ধিয়াং পতির্লোকপতিধাপতিঃ।
পতিগতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্ত্বতাং প্রসাদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ।।''[১৮]

উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায়, এই জগৎ তথা বিশ্বব্রহ্মান্ডে যিনি পালক, রক্ষক, সৃষ্টি স্থিতি লয় এর হেতু সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষ, পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গীতার আদর্শবাণী যদি আমরা চলার পথে পাথেয় করতে পারি এবং নিত্য ভগবৎ সেবায় নিমগ্ন থাকতে পারি, তাহলে মুক্তি সম্ভব, কিন্তু বর্তমান দিনে আমাদের কর্মমুখর জীবনে আমরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ছি যে গীতার আদর্শবাণীকে সমাজে গ্রহণোপযোগী করে তুলতে পারছি না। কাজেই আমরা যেন এই জগতের হর্তা, কর্তা, বিধাতা - এ মিথ্যা জ্ঞানের অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে কেবল আমার আমার বলে চিৎকার করতে থাকি। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো জ্বলন্ত সমস্যাটি হল ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষ। ধর্মান্ধতায় মত্ত হয়ে আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের স্বধর্ম, তাই হিন্দু -মুসলিম-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন সবাই যে যার নিজের সৃষ্টিধর্মকে সবার উপরে তুলে ধরতে চায়। ভাবতে অবাক লাগে ধর্মের নামে আইএস জঙ্গী গোষ্ঠীর হাতে নিহত হয়ে হয় খ্রিষ্টান ধর্মালম্বী জাপানী পণবন্দীদের, তালিবানের হাতে গুলিবিদ্ধ হতে হয় স্কুলের শিশুদের। এটাই কি জেহাদিদের স্বধর্ম ? ক্ষমতার আগ্রাসন নীতিতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি আধিপত্যের মিথ্যা আস্ফালন। বিশ্বের কোন প্রান্তে আজ শান্তি নেই। ইতিমধ্যেই নেপালের ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ মৃত তা দেখেও আমাদের শিক্ষা হয় না যে 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'।[১৯] তাই এই নশ্বর জড়দেহটিকে সযত্নে লালন-পালন করে, মনের চাহিদা অতৃপ্ত রেখে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয়। তাই সেই ইচ্ছাপূরনের জন্য পুনরায় আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। কাজেই ভবচক্রের নিয়মে আবার এই জগৎনামক কারাগারে আবদ্ধ হয়ে সেই জড়া-ব্যাধি সহ্য করতে হয়। তাই জ্ঞান, ধর্ম, কর্ম, সেবা, ভক্তি-প্রতিটি বিষয়েই যদি আমরা গীতার ভাবনায় ভাবিত হতে পারি তাহলে একদিকে যেমন এই জড়া জগতের শান্তি ফিরে আসবে তেমনি আমাদের পরমপিতা ভগবান স্বয়ং যিনি সমস্ত ধর্ম-কর্ম-এর উর্দ্ধে তিনিই আমাদের মুক্তির পথ দেখাবেন। গীতার মোক্ষযোগে তাই তিনি বলছেন -

''সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিয়্যামি মা শূচঃ''।[২০]

এখন প্রশ্ন হল ভগবান পূর্বেই বলেছেন স্বধর্ম তথা স্ব স্ব কর্তব্যকর্ম অবশ্য পালনীয়। তাহলে এখানে সর্বধর্ম পরিত্যাগের কথা বলা হল কেন? আসলে স্বধর্মপালনে যেহেতু জাগতিক বিষয় নিয়ে চর্চা করা হয় তাই জাগতিক মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় থাকেনা এবং সমস্ত কর্মের কর্তৃত্বরূপে কর্মকর্তার মিথ্যা জ্ঞানের অহঙ্কার জন্মায়, তাই সর্বধর্ম পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে ভগবৎভাবনাহীন ধর্মকর্ম ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। একমাত্র পরমেশ্বর ভগবৎভাবনাময় কর্ম মুক্তির পাথেয়।

পাদটীকা ঃ- (End Notes)

১. ''অপরেয়মিতস্ত্বন্য প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদম্ ধার্যতে জগৎ।।'' (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৭..৫)
২. শ্রীমদ্ভাগবৎ, ১০.৮৭.৩০
৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ২.২০
৪. ''ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূয়ব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতো'য়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।''
(কঠোপনিষদ, দ্বিতীয়বল্লী, শ্লোক- ১৮)
৫. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৩.৮
৬. বিষ্ণুপুরাণম্, ৩.৮.৮
৭. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ২৮.৬
৮. ঐ, ৫.২
৯. ঈশোপনিষদ্, শ্লোক -২
১০. ''নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্তিকমুচ্যতে।।'' (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৮.২৩)
১১. ''যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজাসমুদাহৃতম্।।'' ((ঐ, ১৮.২৪)
১২. ''অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।।'' ((ঐ, ১৮.২৫)
১৩. ''কাম এষ ক্রোধ এষ রাজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।'' (ঐ,৩.৩৭)
১৪. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪.১৩
১৫. ''শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।'' (ঐ, ১৮.৪২)
১৬. ''শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ (ঐ, ১৮.৪৩)
১৭. ''কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।'' (ঐ, ১৮.৪৪)
১৮. শ্রীমদ্ভাগবৎ, ২.৪.২০
১৯. ''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যে'র্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হাসি।।'' (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ২.২৭)
২০. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৮.৬৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ (References)

১. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, (তত্ত্ব বিবেচনী) বৃহদাকারে, জয়দয়াল গোয়েন্দকা কর্তৃক সম্পাদিত, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর।
২. শ্রীমদ্ভাগবৎ, গীতা মাইতি কর্তৃক সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় পুর্নমূদ্রণ, ২০১৩।
৩. কঠোপনিষৎ, স্বামীজুষ্টানন্দ কর্তৃক অনূদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় পুর্ণমূদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১৩।
৪. বিষ্ণুপুরাণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।
৫. উপনিষদ্, হরিকৃষ্ণদাস গোয়েন্দকা কর্তৃক সম্পাদিত, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, দশম পুর্নমুদ্রণ, ২০১৪।
৬. A.C. Bhaktivedanta, Swamiprabhupada. The Science of Self -Realization, The Bhaktivedanta Book Trust, Mumbai, 24th Printing, January, 2014.
৭. Swami Ranganathananda, Science and Religion, Advaita Ashrama, Kolkata, Second Edition, March 2013.